OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 207 - 213
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 207 - 213
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বঞ্চনার ইতিহাস ও প্রান্তিক মানুষ : তপোবিজয় ঘোষের নির্বাচিত ছোটগল্প

সুদেব বোস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: titu.83.4bose@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Tapabijoy Ghosh, short stories, marginal men, poverty, leftist, inequality, village.

Abstract
In this essay we focus on a leftist writer Tapabijoy Ghosh, who wrote nearly 50 short stories Between 1959-1990 and always had a deep faith on class struggle. He is one of the notable writers on leftist cultural front and always protested for the deprived poor people. As a soil of sun of a village he had seen the marginal men of Bengal. He witnessed their poverty, their humiliation and tortured life. In his writing he depicted all those and always ended with a powerful protest. In this essay we explained the crisis of poor marginal persons and the writer's point of view over the subalterns. We discussed four stories and some tried to focus on this less-known writer. In his time Tapabijoy Ghosh was a prominent writer of progressive leftist camp. Now he is almost out of reach of the readers but still the inequality exists in society. So he is still a must-read writer.

Discussion

॥ ১॥

সাতচল্লিশের দেশভাগ ও বিপুল সংখ্যক হিন্দু-বাঙালির অভিবাসন নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী। সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছিলেন কীভাবে পূর্ববঙ্গের হিন্দু-বাঙালি ভারতে এসে অসহায় উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির উপর এই উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার প্রবল চাপ এবং প্রশাসনিক সমস্যার কথাও বিধৃত রয়েছে এই বইতে। তবে এই বইয়ের প্রধান বিষয় অবশ্যই ছিল দেশহারা মানুষের অসহায়তা ও তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলহ আচরণ। রবীন্দ্র পুরমস্কারপ্রাপ্ত এই বইটির নাম 'The Marginal Men', অনুবাদে তার নাম হয় 'প্রান্তিক মানব'।

'প্রান্তিক' শব্দটির অর্থ প্রফুল্লকুমার দেখিয়েছেন মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অসহায় মানুষ, যারা রাষ্ট্রের স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দেশভিগের মর্মন্তুদ ইতিহাসকে মনে রাখলে, এই ভয়াবহ অভিবাসন চলাকালীন মৃত্যু-অপহরণ-ধর্ষণ-গৃহহারা হওয়ার পরিসংখ্যানকে বিবেচনা করলে তাদের প্রান্তিক বলে মেনে নিতে অসুবিধা হয় না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 207 - 213
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একই সঙ্গে একথাও বিচার্য যে তারা ভৌগোলিক পরিচয়হীন একদল মানুষ। 'প্রান্তিক' শব্দের ইংরেজি পরিভাষা Marginal man-এর অর্থ বোঝাতে গিয়ে বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক Robert Ezra Park লিখেছেন—

> "One of the consequences of migration is to create a situation in which The same individual - who may or may not be a mixed blood-finds himself Striving to live in two diverse cultural groups. The effect is to produce an Unstable character-a personality type with characteristic forms of behaviour That is the 'marginal man'."[১]

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে Park সর্বপ্রথম Marginal Man শব্দটি ব্যবহার করেন। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী মানুষ যাদের জীবনযাপন কঠিন ও সুবিধাবঞ্চিত, তাদেরকেই নির্দেশ করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন Migration কে। আবার ১৯৩৭ এ বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক Everett Stonequiest তাঁর *The Marginal Man* বইতে লেখেন –

> "The marginal man ... is one whom fate has condemned to live in two societies and in two, not merely different but antagonistic cultures."[২]

এক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে দুর্ভাগ্যের প্রসঙ্গ। অর্থাৎ দুটি সংজ্ঞাতেই স্পষ্ট যে প্রান্তিক জীবন কখনো আনন্দের হতে পারে না। সেই মানুষদের জীবনে সাংস্কৃতিক সংকট যেমন তেমনই থাকে তেমনই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে অর্থাভাব। এভাবেই প্রান্তিক মানুষ হয়ে ওঠে একটি বিশেষ শ্রেণি, যারা অবশ্যই দরিদ্র এবং অনেকক্ষেত্রেই সংখ্যালঘু। Stonequist এই মানুষদের উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন মূলাটো, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ইত্যাদি জাতকে। ভারতে বসবাসকারী যে শ্রেণিদের প্রান্তিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাদের ক্ষেত্রে জাতিগত প্রশ্নের সঙ্গেই মিশে থাকে চরম বঞ্চনার দিকটিও। ন্যূনতম আহার্যের সংস্থানটুকু না থাকা মানুষরাও ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রান্তজন বা অন্তেবাসী হিসেবে চিহ্নিত হন। বাংলা সাহিত্যেও প্রান্তিক মানুষ হিসেবে দীর্ঘকাল ধরেই তাঁরাই দারিদ্র্যের শেষ সীমায় অবস্থান করেন। চর্যাপদে টিলার উপর বসবাসকারী নারী যেমন নিরন্ন, কয়েক'শ বছর পেরিয়ে গিয়ে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল*-এর ব্যাধপত্নী ফুল্লরার বয়ানেও পাওয়া যায় সেই করুণ দারিদ্র্যের ছবি। সেখানেও আমানির পচা জলটুকুই হয়ে ওঠে ক্ষুধানিবৃত্তির একমাত্র পথ।

সমাজের মূলস্রোতের বাইরে চলে যাওয়া মানুষরা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যায় অসহায় এবং সুবিধাবঞ্চিত। এই পরিস্থিতিতেই তাদের একমাত্র ভবিতব্য হয়ে ওঠে সীমাহীন দারিদ্র্য। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগেও এই বাস্তবতা নিত্য বিদ্যমান। বিশ শতকের কথাসাহিত্যের জগতে প্রান্তিক জীবনের কঠিন সংগ্রামের ছবি ধরা পড়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সতীনাথ ভাদুড়ী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সমরেশ বসুর কলমে।

কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনায় এই পরিচিত স্রষ্টাদের বৃত্তের বাইরে থেকে এমন একজনকে বেছে নিয়েছি যিনি প্রগতি সাহিত্যের জগতের সাহিত্যিক। একজন কমিটেড বামপন্থী ছোটগল্পকার হিসেবে নিজের ছোটগল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন সমাজের সম্পন্ন বৃত্তের বাইরে থাকা নিম্নস্তরের জীবন-সংগ্রামের ছবি। সেই গল্পকার, তপোবিজয় ঘোষের কথাসাহিত্যের জগতে পরিচিতি তাঁর *কালচেতনার গল্প* (২ খণ্ড) এর জন্যই। এই গল্পসংগ্রসের দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত 'এখন প্রেম' গল্পটি বর্তমানে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আমরা বেছে নিয়েছি তাঁর অন্য একটি স্বল্পপরিচিত গল্পসংগ্রহ *ইতিহাসের মানুষ*- কে। এখানে সংকলিত কয়েকটি গল্পে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব অন্ত্যজ সমাজের অসহায়তার ছবি এবং একই সঙ্গে একজন বামপন্থী সাহিত্যিকের দায়বদ্ধতাকে।

॥ ২॥

তপোবিজয় সর্বতোভাবেই রাজনৈতিক কথাকার এবং একথা সোচ্চারে ঘোষণা করতে তাঁর কখনো কুণ্ঠাবোধ ছিল না। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *কালচেতনার গল্প* বইটির প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লেখেন –

> "দেশ যখন একদিকে ক্ষুধা ঘৃণা প্রতিবাদ ও ক্রোধের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল, আর অন্যদিকে বুলেটে বেয়নেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে পথে প্রান্তরে অরণ্যে বন্দীশালায় অবিরাম রক্ত ঝরাচ্ছিল তখন নিরাপদে গৃহকোণে বসে বাঁশি বাজাইনি।"[৩]

তাঁর কাছে সাহিত্য হল নিজের রাজনৈতিক ভাবনার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে *কালচেতনার গল্প* সংকলনের দুটি খণ্ডে যে বত্রিশটি গল্প স্থান পেয়েছে সেগুলি প্রধানত শহরকেন্দ্রিক। অন্যদিকে, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর *ইতিহাসের মানুষ* নামে একটি গল্পসংকলন প্রকাশিত হয় নবজাতক প্রকাশন থেকে। এখানে স্থান পেয়েছে বারোটি গল্প; এবং অধিকাংশ গল্পেই প্রাধান্য পেয়েছে সমাজের সম্পন্ন ভদ্রশ্রেণির বাইরে হতদরিদ্র মানবগোষ্ঠী। সামাজিক সম্মানেও তারা নিম্নস্থানীয় এবং আর্থিকভাবেও অত্যন্ত দুর্বল। এগুলির মধ্য থেকে পাঁচটি গল্পকে বেছে নিয়ে আমরা দেখাতে চাইব তপোবিজয়ের জীবনদর্শনকে।

আমাদের আলোচনায় প্রথম গল্পটিই এই সংকলনের প্রবেশক 'রাসুর সুখদুঃখ'। রাসু নামে এক মজুর যে সারাদিন পরিশ্রম করে একগাড়ি বালি শেতলবাবুকে পৌঁছে দিতে। তার পরিচয় হল তিনটে মরকুটে বাচ্চা আর বউ-সহ একটা খোড়ো ঘরের মালিক। মরুখি অর্থাৎ ময়ূরাক্ষীর চর থেকে বালি তুলে সে পৌঁছে দেয় বড়লোক বাবুদের বাড়িতে। কিন্তু এই সামান্য আখ্যানের মধ্যেই ধরা পড়ে একের পর এক ছবি। রেশন দোকানের মালিকের কাছে কুড়ি টাকায় বাঁধা থাকে রাসুর রেশন কার্ড, সে থেকে যায় নিরন্ন। ভদ্দরলোক পালু ঘোষ মেধোর মাকে বলপূর্বক ভোগ করে। এই ইতিহাস জানলেও সে কখনো উচ্চারণ করার সাহস পায় না। কিন্তু অভাবের কারণে সামান্য ওলন বা হাতুড়ি চুরি করায় সে গোটা গ্রামে চোর বলে চিহ্নিত হয়।

এ গল্পে সহজেই অনুমেয় যে রাসু আসলে এক বিকট, ভয়াবহ অভাবের অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাই চুরি তার কাছে বেঁচে থাকার একটা খড়কুটো। কিন্তু তপোবিজয় এভাবেই রাসুকে চিহ্নিত করে দেন প্রকৃত প্রান্তিক হিসেবে। সঙ্গে মিলে যায় সাঁওতাল কুলি কামিনরাও, যাদের উদ্দেশে রাসু বলে 'শাড়ি পাবে, পয়সা পাবে, উয়ার সনে পেটে ছেইল্যাও পাবে'। ময়ূরাক্ষীর তীর, অর্থাৎ লালমাটির দেশে সমাজের সুবিশাল মহীরুহদের কাছে রাসুর পরিশ্রম আর সাঁওতাল কামিনের যৌবন দুটোই সমান সহজলভ্য। অভাবের কারণে রাসুর চুরি গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের কাছে কৌতুকের, কিন্তু রাসুর কাছে প্রতিমুহূর্তে অপমানের, যন্ত্রণার। সে যন্ত্রণা বহুগুণ বেড়ে যায় যখন সে শোনে শেতলবাবু দশ পয়সা টিনের হিসেবে বালির দাম দেবেন, যাতে তার গরুর গাড়ির ভাড়াও উঠবে না। দুটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমরা বোঝাতে পারি রাসুর অসহায়তা— "রাসু কঁকিয়ে উঠল, 'না বাবু চল্লিশ পয়সা টিন! আপনি এজ্ঞে শুধুন পাঁচজনাকে—" "নিজেকে মনে হয় ঘা খাওয়া আধমরা ছাগলছানা, নীচে শক্ত কাঁকুরে মাটির পাঁশুটে ঘাসে চিৎ হয়ে পড়ে ধুঁকছে। নড়াচড়ার শক্তি নেই। শকুনের ডানা তার উপর ছায়া ফেলে খুবলে নিতে এগিয়ে আসছে...।"

১৯৯৩ এর সুদানের দুর্ভিক্ষের সময় কেভিন কার্টারের তোলা The Vulture and the Girl ছবিটি সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল। একটি হাড় জিরজিরে নিরন্ন মেয়ে (পরে জানা যায় সে ছেলে) এগিয়ে চলেছিল UNO পরিচালিত একটি খাদ্যসংগ্রহ কেন্দ্রের দিকে। পথে সে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছেআর তার মৃত্যুর অপেক্ষায় রয়েছে একটি শকুন। বারো বছর আগে তপোবিজয় লিখেছেন এই গল্প, আরো আগে তিনি লিখেছেন— 'আমেরিকার চন্দ্রযান ও পতিতপাবন' এর মত গল্প। বারবার তাঁর চেতনায় ধরা দিয়েছে মানুষের অনাহার ও দারিদ্র্য। আলোচ্য গল্পটির সঙ্গে মিলে যায় ওই বিশ্ববিখ্যাত ছবিটিও। বোঝা যায় যে নিম্নবর্ণের বাঙালি আর এক কৃষ্ণাঙ্গ শিশু, দুজনেরই শিরোভূষণ হল দারিদ্র।

এই গল্পের শেষে কিন্তু রাসু হেরে যায় না। বরং দশ পয়সা দরে বালি না বেচে সে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যায় গ্রামের পথে। তীব্র রাগে সে স্বগতোক্তি করে বলে যায় মানুষের অধিকার যারা কেড়ে নেয়, গ্রামকে যারা উপোসী রাখে তারাই আসল চোর। কিন্তু রাসুর এই বঞ্চনা ও তার পাশে জোতদার-রেশনমালিকের মুনাফা, একেই তপোবিজয় দেখেন প্রকৃত প্রান্তিকের যন্ত্রণা হিসেবে। সেখানে জাতিপরিচয় গৌণ হয়ে যায়, জেগে থাকে ধনী-দরিদ্রের চিরন্তন শ্রেণি পরিচয়।

এই সংকলনের দুটি গল্প 'প্রতিপক্ষ' ও 'চক্রান্ত'তেও রয়েছে এই অনাবিল ক্ষুধার যন্ত্রণা। এই দুই গল্পের চরিত্ররা প্রান্তিক না হলেও আন্তরবৈশিষ্ট্যে সমাজের চূড়ান্ত পশ্চাদপর অংশের প্রতিনিধি। 'প্রতিপক্ষ' গল্পের দুটি চরিত্র, রিক্সাওয়ালা

সিধু ও দোকানদার অনাদি। কাল রাত থেকে প্রায় উপোসী সিধু অনাদির কাছে চা-খাবার চায়। অনাদি ধারবাকির কথা তুলে অপমান করায় শুরু হয় বচসা, যা অচিরেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের চেহারা নেয়। এ গল্পে সিধুর অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় এবং অনাদি তার চাইতে উচ্চস্তরে অবস্থান করে। উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের মধ্যেই সিধুর স্বগতোক্তি—

> "আমি শালা কাল রাতে ভাত খাইনি, দেড়খানা রুটি চিবিয়ে জল খেয়ে পেট ভরিয়েছি। সকালে রিক্সা টানতে পেটের নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসছিল – তাই না তোর দোকানে একটু চা খেতে এলাম।"

অন্যদিকে অনাদিও ফেটে পড়ে তীব্র রাগে—

> "আমার দোকানে চা মুড়ি খেলি, পয়সা বাকি ফেললি, আর উল্টে আমার গায়েই হাত তুলতে আসিস। তোর কেন কুষ্ঠ হয় না শালা...।"

গল্পের প্রথমভাগে যে অনাদিকে আমরা দেখতে পাই দোকানে মোটামুটি সম্পন্নতার ছবি। সেখানে রয়েছে 'মুঠোভর্তি কয়লা', 'গোলা বেষনের উপর পেঁয়াজকুঁচি', 'মস্ত বড় গামলা' ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে অনাদির সচ্ছলতা। অন্যদিকে সিধুর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকে 'গর্তে ঢোকা চোখ', 'ধনুকের মত পিঠ' অর্থাৎ অনেক বেশি দরিদ্র সে। চা-খাবারের ঝগড়া যখন অনাদির বউ এর পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে গড়ায় তখন মজা দেখতে চলে আসে আরো একদল লোক।

এই পর্যায়ে গল্পটি ছিল ধারবাকি সংক্রান্ত, যেখানে অনাদি উত্তমর্ণ ও সিধু অধমর্ণ। কিন্তু প্রচণ্ড শব্দ তুলে এসে পৌঁছায় ঘোষবাবুর জীপ, যিনি এই অঞ্চলের বেশিরভাগ রিক্সা এবং জমির মালিক। তাই তাঁর আসামাত্রই বদলে যায় পরিবেশ—

> "পটল রিক্সা রেখেই পালাল।"
>
> "অনাদির ছোটখাট বেঁটে শরীরটার পাশে সিধুর পাতলা, লম্বা শরীরটা। দুজনেরই মুখ রক্তহীন, পাণ্ডুর, চোখের দৃষ্টি ফ্যাকাসে। আর দুজনের বুকেই একটা দমচাপা আশঙ্কা খাঁচায় পড়া ইঁদুরের মত ছটফট করছে। এখন যেন ওরা জাতের একগোত্রের মানুষ।"

নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে হালকা হাসি ঝুলিয়ে ঘোষবাবু বলে যেতে থাকেন অনাদি আর সিধুর সামান্য, সম্বলটুকু তাঁর হাতেই বাঁধা। ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে তাদের দুজনেই নিঃস্ব হয়ে যেতে বসেছে ঘোষবাবুর কাছে দেনার দায়ে। রিক্সা কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেন ঘোষবাবু সহজাত ভঙ্গিতে। দুই প্রকৃত অধমর্ণের মাথার উপর দিয়ে কার্যত চলে যান তিনি—

> "মুখের হাসি হাসি ভাবটুকু গুটিয়ে নিয়ে পুনশ্চ আদালতের রায় পড়েন ঘোষবাবু।"
>
> "প্রকাণ্ড হাঙরের মুখের মত হাঁ করে গাড়িটা স্টেশনের দিকে এগুতে থাকল।"

বিবদমান দুটি মানুষ মুহূর্তে নিজেকে আবিষ্কার করে একই শোষণযন্ত্রে বলিপ্রদত্ত পশু হিসেবে। দুটি সাঁওতাল মেয়ে এসে বসে অনাদির দোকানে। কিন্তু এখানে মুছে যায় জাতের পরিচয়, ধারবাকির বিভাজন। অনাদির মনে হয় আগামী দিনে কী হবে তার ভবিতব্য, কীভাবে সে বাঁচাবে সংসার। সমশ্রেণির সিধুর সঙ্গে ঝগড়ার বদলে সে তাকে চা খেতে ডাকে। আসলে তারা দুজনেই শোষকের হাতের ক্রীড়নক। অর্থ ও ক্ষমতা এভাবেই প্রান্তিক করে দেয় অসংখ্য দরিদ্রকে।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের এই গল্পে যেমন শহরাঞ্চলের জমি-হাঙরদের ছবি দেখা যাচ্ছে তেমনই ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'হাটের কড়চা' গল্পে দেখা যায় গ্রামের জোতদারি জুলুমের ছবি। একটি গ্রামের মাঝখানে একটি বড় হাট। সেখানে চারপাশের গ্রামগুলোর খেটে খাওয়া গরিব মানুষ সারা সপ্তাহের সদটুকু জোগাড় করে। রকমারি জিনিসের পাশাপাশি নানা উপজাতি এবং নানা পেশার মানুষরা এসে জড়ো হয়। আর আসে বৃদ্ধ ভগীরথ।

আশৈশব সে এই হাটের মানুষ। তার মা আগুনের হাত থেকে বাঁচতে ধানমাঠের মাঝখানে তাকে জন্ম দেয়, তাই সে-ই একমাত্র জাতচাষা। এ গ্রামের ইতিহাস সে বলে চলে মুখে মুখে—

> "সেই যি গো, যিবার মুনদারবাবুর লুকেরা আমাদের বেবাক ঘরবাড়ি পুড়ায়ে দিলেক, সিই ত্যাখুন আমি মায়ের প্যাটে।"
>
> "হুই যে বাউল-ট গান গেছে, উয়ার বাপকে কালীতলার মাঠে সাপে কেটেছিল এই এত বড় এক-ট তক্ষক সাপ।"

ভগীরথ যেন এক চাষা নয়, বরং এক প্রাজ্ঞ গাঁওবুড়ো, যে বারবার রোমন্থন করে অতীতকে। জীবনের সায়ংকালে অতীতটুকুই তার শেষ সম্বল। কথা শুনতে জড়ো হয় গ্রামের মুনিষ, মাহিন্দার, বাগালরা। তাদের খড়ি ওঠা পা, কালো শরীর, শুকনো মুখ দেখে বুঝে নেওয়া যায় তাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান। কিন্তু এই সংলাপের মধ্য থেকেই উঠে আসে প্রশ্ন—

> “এত সস্তার দিনেও জমি-জায়গা হাল-বলদ হয়নি কেন তাদের? পেট ভরে কেন খাবার জোটেনি? ... তখন তাদের যে কষ্ট ছিল এখনো সেই কষ্ট! তাহলে?”

এই মানবগোষ্ঠীর কাছে বেঁচে থাকার অবলম্বন এই হাট। এখানেই বারবার নেমে আসে শোষণের কঠিন দণ্ড। কখনো মহাজনের চেহারা ধরে, কখনো বা কার্তিকের চেহারা ধরে, যে এই হাটের ইজারাদার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাবান। সে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে—

> “শালোরা শুনে রাখ, এখন এই গাঁ-ঘর জমিজিরেত হাটবাজার সব আমাদের। থানাপুলিশ আমাদের গোলাম-হুকুমের চাকর।”

কার্তিকের দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে যায় শিক্ষক ব্রজেন পাড়ুইয়ের হত্যা, ডোমদের মেয়েকে ধর্ষণ এবং হাটে জুলুম করে চাঁদা আদায়। গরিব চাষী বা বিক্রেতার উপর এই নির্যাতন দেখে ক্রমশ বিবর্ণ জনহীন হতে থাকে হাট। সাঁওতাল মেয়েদের মাদল বাজিয়ে গান আর নাচের ছবি ভাবতে থাকে ভগীরথ আর ক্রমশ বুঝতে পারে ‘এ বড়ো সুখের সময় নয়’। বলাইয়ের হাত মুচড়ে কুড়ি টাকা আদায়ের দৃশ্য নির্বাক হয়ে দেখে গোটা হাট, প্রতিবাদহীন হয়ে, কারণ—

> “ভোটের ঘরে বোমা আর ধানমাঠে ব্রজেন পাড়ুইয়ের ধড়মুণ্ড আলাদা দেখার পর থেকে সবাই যেন কেমন বোবা বনে গেছে।”

ভগীরথ, তার পরিবারসহ অনেকেই গরিব চাষী বা মজুর। কিন্তু ক্ষমতার প্রবল ভীতি তাদের আরো কোণঠাসা করে রাখে। তাই সে বারবার বলতে থাকে যে হাটে আর পুরুষ মানুষকে আছে। এই গল্প ধারণ করে আছে সত্তরের দশকের গ্রামের আতঙ্কময় পরিবেশকে। এই সময়ের প্রশাসের স্বরূপ চেনাতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন—

> “সমাজজীবনের সকল স্তরে মস্তান বা পশুশক্তিকে মদতদান। রাজনীতির নিম্নতম স্তরে মস্তানদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। ফলে এক বৃহৎ যুব সমাজ মস্তানিকে পেশা করে, বিশেষ করে গরিব খেটে খাওয়া মানুষের ঘাড় ভেঙে খাওয়ার পথ পেয়ে গিয়েছে।”[৪]

এক ক্লান্ত, করুণ সন্ধ্যা নেমে আসে হাটের উপরে। ভগীরথ তার ভাঙা গলায় বলে, ইঁদুর-পোকা তেমন কোনো ক্ষতি করে না, তাই সবাইকে এবার শিখতে হবে মানুষ মারা বিষের ব্যবহার। আরো বেশি প্রকট হয়ে ওঠে প্রান্তিক মানুষের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর পাল্টা মার দেওয়ার শপথ। এই গ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে আছে জোতদার বা মহাজনকে সরাসরা সশস্ত্র আক্রমণ (ইতিহাস) বা সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাসকে (চালচিত্র) তুলে ধরা। রক্তের বদলা রক্ত দিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার। সহজেই অনুমেয় এই শপথ শহরের শিক্ষিত সমাজের কাছে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই এই গ্রন্থে বারবার গ্রামের অসহায় অগণিতের দিকে চেয়েছেন, তাই তাঁর বন্ধু ডঃ পল্লব সেনগুপ্তের মতে—

> “তপোবিজয় গ্রামকে শষ্পমূল থেকে চিনতেন।”[৫]

তপোবিজয়ের গল্পের সবচেয়ে বড় দিক হল এক শ্বাপদসংকুল পথের শেষে আশার আলোটুকু জিইয়ে রাখা। সে আলো আর কিছুই নয়, প্রতিবাদ এবং অনেকক্ষেত্রেই তা সহিংস পথে। আমাদের আলোচিত তিনটি গল্পে আমরা দেখেছি সমাজ ও অর্থনীতি কীভাবে একদল মানুষকে ঠেলে দেয় মূলস্রোতের বাইরে। তিনটি গল্পের ঘোষবাবু, শীতলবাবু, কার্তিকরা ক্রমশ হয়ে ওঠে সমাজের নিয়ন্ত্রক, কখনো জমি দখলের মাধ্যমে, কখনো ন্যায্য মজুরি ফাঁকি দিয়ে। প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে থাকা এক মনস্তাত্ত্বিক চাপ প্রতিমুহূর্তে পিষ্ট করে প্রান্তিক হয়ে যাওয়া মানুষগুলিকে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস তো শুধুই বিনা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 207 - 213
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রতিরোধে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার নয়। ইতিহাস গল্প বলে প্রত্যাঘাতের এবং তা কখনো সশস্ত্র কখনো বা কৌশলী। এমনই দুটি গল্প দিয়ে আমাদের আলোচনায় আমরা দেখাতে চাইব অত্যাচারিতের প্রতিরোধ।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের শারদীয় *সারস্বত* পত্রিকায় বেরিয়েছিল তপোবিজয়ের গল্প 'বেইমান'। আখ্যানের পটভূমি 'অপারেশন বর্গা' অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষকের হাতে জমির অধিকার পাইয়ে দেবার উদ্যোগ। গ্রামের বেশিরভাগ জমির মালিক গোকুল রায়। ভূমি-সংস্কারের নামে তাঁর চরম ভীতি, কারণ তাহলে ভাগচাষীকে প্রয়োজনমত উচ্ছেদ করা যাবে না। এই গল্পে অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি জাতিগত বিভেদটুকুও খুব স্পষ্ট। রায়মশাইয়ের প্রবল শঙ্কা—

> "নিজের বাপঠাকুর্দার জমিতে এখন হাঁড়িবাগদি-বাউড়িডোমেরা দখলিপাট্টা নিয়ে গাজনের নাচ নাচবে। এ যেন বিয়ে করা মাগের উপর অন্য মরদের বলাৎকার।"

বাউড়ির শ্রেণিপরিচয় কিছু বেশিই ভাবিত করে রায়মশাইকে তাই কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলার নীতি নেন তিনি। তার বশংবদ রতন বাউড়িকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি বোঝান পাট্টা বিলি হলে তাদের পক্ষে চাষ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠবে কারণ তাঁর কাছ থেকে হালবলদ, বীজধান কিছুই পাবে না। তাই তারা যেন নিজেদের কিষাণ হিসেবে দাবি না করে। রতন ঘাম ঝরিয়ে ফসল ফলানোর কাজটুকু জানে, আর জানে গ্রামবাংলার সুদীর্ঘ লালিত শ্রেণিবিভাজনের ইতিহাসটুকু ঢাকা পড়ে যায় একগ্রাস মিঠা চায়ের স্বাদে। সামান্য খাতিরটুকুকে কাজে লাগিয়ে রায়বাবু তাকে শপথ করিয়ে নেন ঠাকুরের বেদী ছুঁইয়ে। কিন্তু এ সবই তুচ্ছ হয়ে যায় সোনালি ফসল আর তপ্তভাতের কথা ভেবে, তখন আর রতন উত্তমর্ণ জমিদারের ক্রীড়নক হয়ে থাকে না, সে রায়বাবুকে স্তম্ভিত করে বলে—

> "কুন শালো আমারে বলে মান্দের? বলুক দেখি মা লীঅক্ষীর আটনে দাঁড়িন? শালোর জিব্ টো আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলাব না!"
>
> "হুই পুকুরপাড় থেকে গাছবরাবর জমি আমি দেখালাম সবই তো এককালে আমাদের বাউড়িদের ছিল বাবু! আপনার পেটে কি করে ঢুকে গেল সেই হিসেবটো পাঁচজনাকে না দিয়ে আমাকে বেইমান বললে সিটো ভারি অধম্ম হবে মশয়।"

জমির আবেগের কাছে অনার্য কৃষকের ধর্মভয়ও পরাজিত হয়। রায়বাবু মূর্ছাহত হয়ঁ দেখেন ছোটজাতের একদল চাষার হাতেই তার হাতেগড়া সাম্রাজ্যের পতন হচ্ছে। এ পতন একইসঙ্গে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রেরও শেষ চিৎকার। রতন বাউড়ির প্রতিবাদ যেমন সোচ্চার তেমনই এক কৌশলী প্রতিশোধ নেয় সুবল, 'চক্রান্ত' গল্পে। সনৎ হালদারের গাছের কাঠ চেলা করতে তার পাওনা মজুরির তিনটাকা বাকি ছিল। দিনের পর দিন ঘুরেও সে টাকা পায় না সুবল। পেটে অনিঃশেষ খিদে নিয়ে সে বারবার ঘুরে বেড়ায় হালদারের বাড়ির চারপাশে। উল্টে হালদারই এক আজব ধারের হিসেব দেখিয়ে সেই মজুরিকে একটাকা বানিয়ে ফেলে। হতবাক সুবল দেখে সেই আসলে এক অদ্ভুত ঋণের দায়ে আটকা পড়ে গেছে। কপালে করাঘাত করে সে ভাবে—

> "আসলে মানুষটাই যে নিরীহ ও ভিতু প্রকৃতির। ঈশ্বর, প্রকৃতি ও মানুষের আতে জন্ম থেকে মার খেয়ে খেয়ে এখন মার খাওয়াটাকেই নিয়তি বলে জানে।"

"যেখানে কাজ কম, মুনিষ বেশি সেখানে গতরের দাম কানাকড়ি এবং গোয়ালে বাঁধা গরু হয়ে গুঁতো খাওয়াই নিয়তি।" আমাদের আলোচিত গল্পগুলিতে আমরা বারবার দেখেছি মানুষকে মুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে তুলনা এবং ভদ্রসমাজে অথবা সমাজের বাইরে থাকা অসহায় মানবগোষ্ঠীর ক্রমশ রিক্ত, হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ। এই অসহায়তা, এই নিঃস্ব হয়ে যাওয়াই প্রান্তিক হয়ে ওঠার প্রথম পর্ব বলে দেখিয়েছেন তপোবিজয়। তিনদিন জ্বরের পর সামান্য ভাত জোটাতে অক্ষম সুবল মরা কুকুর ফেলে এসেও দেখে তাকে মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তখন তীব্র আক্রোশে সে রটিয়ে দেয় ঘরে সাপ ঢুকেছে। ভীত, সন্ত্রস্ত ঘোষবাবুকে দেখে সুবল যেন 'অফার' দেয়—

> "আমার খাটালির মজুরিগুলান দেন আজ্ঞে। আমি ছুট্যে গিয়ে গুণীন্ লিয়ে আসছি।"

এই আচরণ শুধু অধিকার বুঝে নেওয়া নয়, একই সঙ্গে দীর্ঘ বঞ্চনার প্রতিশোধ। তপোবিজয়ের গ্রামভাবনা আসলে গ্রামের বঞ্চিত, দরিদ্র মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চনার ইতিহাস। *ইতিহাসের মানুষ* বইটির বেশিরভাগ গল্পই উত্তররাঢ়ের লাল

পাথুরে মাটি থেকে উঠে আসা। স্বয়ং লেখকও সেখানেরই ভূমিপুত্র, তাই সাক্ষী থেকেছেন এই জীবনচিত্রের। তাঁর লেখা *দহনদাহন* উপন্যাসটিতে বিধৃত আছে সেই প্রমাণ। তাঁর ভাবনায় প্রান্তিক মানুষের কাছে জাতের পরিচয়কে তুচ্ছ করে বড় হয়ে উঠেছে ভাতের লড়াই। সেই লড়াইয়ে সাংবিধানিক আইনের চাইতেও বেশি কখনো কখনো তিনি বিশ্বাস রেখেছেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। আধুনিক পৃথিবীর কথাকার হয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন জমির লড়াই আর পরিশ্রমের মূল্যকে। এই পরিশ্রমের কাহিনিচিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি সংযুক্ত করেছেন ইতিহাস ও বর্তমানকে, তাই সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে অপারেশন বর্গা - সবটুকু ধরা পড়েছে তাঁর গল্পে। এখানেই কথাকার হিসেবে তাঁর সার্থকতা।

Reference:

১. Park Robert Ezra, ‘Human Migration and the marginal man’, *American Journal of Sociology,* 1928, pg. 80
২. Stonequiest Evertt, *The Marginal Man:A study in Personalityand culture conflict,* Sribner, 1937, XV. Pg. 97
৩. ঘোষ, তপোবিজয়, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৭, ‘লেখকের কথা’, *কালচেতনার গল্প (১),* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।
৪. দেবী, মহাশ্বেতা, ২০০৪, ‘সত্তরের দশক ও তারপর’, দ্রঃ অনিল আচার্য সম্পা ‘সত্তর দশক’ (২য় খণ্ড), অনুষ্টুপ, পৃ. ১১৮
৫. সেনগুপ্ত, পল্লব, বর্তমান প্রাবন্ধিকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২/১/২০১৮